অজ্ঞাত রচনা

ভালমন্দ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

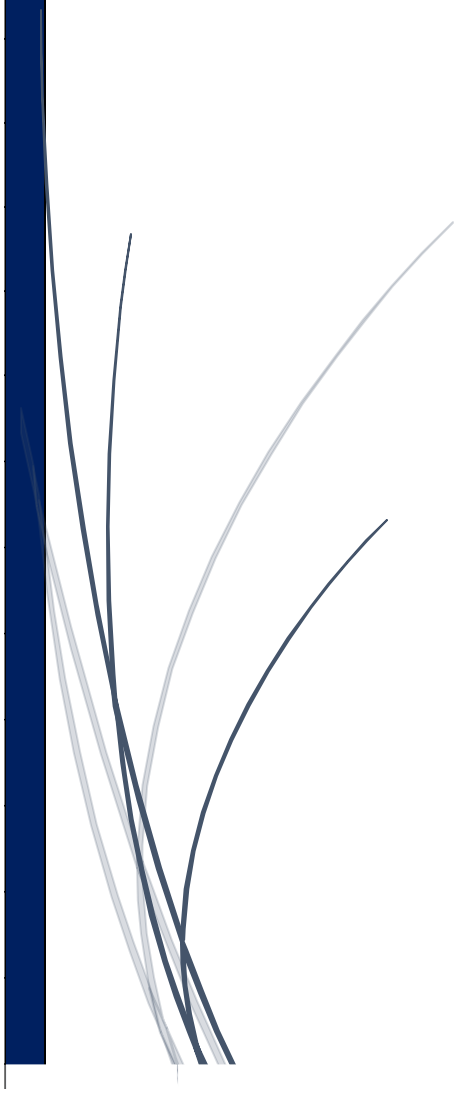

BENGALIEBOOK.COM
2021

ভালমন্দ

অবিনাশ ঘোষাল আরও বছর-কয়েক চাকরি করতে পারতেন কিন্তু তা সম্ভব হোলো না। খবর এলো এবারেও তাঁকে ডিঙিয়ে কে একজন জুনিয়ার মুনসেফ সব-জজ হয়ে গেল। অন্যান্য বারের মতো এবারেও অবিনাশ নীরব হয়ে রইলেন, শুধু প্রভেদ রইলো এই যে, এবারে তিনি ডাক্তারের সার্টিফিকেট সমেত অবসর গ্রহণের আবেদন যথাস্থানে পৌঁছে দিলেন। আবেদন মঞ্জুর হবেই এ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

অবিনাশ সুজন, সুবিচারক, কাজের ক্ষিপ্রতায় সকলেই খুশী, ভদ্র আচরণের প্রশংসা সবাই করে, তবু এই দুর্গতি! এর পিছনে যে গোপন ইতিহাসটুকু আছে কম লোকেই তা জানে। সেটা বলি। তাঁর চাকরির গোড়ার দিকে, একবার এক ছোকরা ইংরেজ আই. সি. এস. জেলার জজ হয়ে আসেন অফিস ইন্‌সপেকসনে। সামান্য ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে প্রথমে ঘটলো মতভেদ, পরে পরিণত হলো সেটা বিষম বিবাদে। ফিরে গিয়ে জজসাহেব নিরন্তর ব্যাপৃত রইলেন তাঁর কাজের ছিদ্রান্বেষণে, কিন্তু ছিদ্র পাওয়া সহজ ছিল না। জজসাহেবের মন তাতে কিছুমাত্র প্রসন্ন হলো না। রায় কেটেও দেখলেন হাইকোর্টে সেটা টেঁকে না—নিজেকেই অপ্রতিভ হতে হয় বেশী। বদলির সময় হয়েছিল, অবিনাশ চলে গেলেন অন্য জেলায়, কিন্তু দেখা করে গেলেন না। শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রচলিত রীতিতে তাঁর দারুণ ত্রুটি ঘটলো। তারপরে কত বছর কেটে গেল, ব্যাপারটা অবিনাশ ভুলেছিলেন কিন্তু তিনি ভোলেন নি। তারই প্রমাণ এলো কিছুকাল পূর্বে। সেই ছোকরা জজ হয়ে এসেছেন এখন হাইকোর্টে, মুনসেফ প্রভৃতির দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে। অবিনাশ সিনিয়র লোক, কাজে সুনাম যথেষ্ট, উন্নতির পথ সম্পূর্ণ বাধাহীন, হঠাৎ দেখা গেল তাঁকে ডিঙিয়ে নীচের লোক হয়ে গেল সব-জজ। আবার এখানেই শেষ নয়, পরে পরে আরও তিনজন তাঁকে

এমনি অতিক্রম করে উপরে উঠে গেল। যাঁরা জানেন না তাঁরা বলবেন, এ কি কখনো হয়? এ যে গবর্নমেন্টের চাকরি! তায় আবার এত বড় চাকরি! এ কি কাজীর আমল! কিন্তু অভিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা বলবেন, হয়। এবং আরও বেশী কিছু হয়। সুতরাং, অবিনাশ মনে মনে বুঝলেন এর থেকে আর উদ্ধার নেই। আত্মসম্মান ও চাকরি দু'নৌকোয় পা দিয়ে পাড়ি দেওয়া যায় না—যে-কোন একটা বেছে নিতে হয়। সেইটেই এবার তিনি বেছে নিলেন।

বাসায় অবিনাশের ভার্যা আলোকলতা, আই. এ. ফেল-করা পুত্র হিমাংশু এবং কন্যা শাশ্বতী। ঝি-চাকরের সংখ্যা অফুরন্ত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না—এত বেশি।

সেদিন অবিনাশ আদালত থেকে ফিরলেন হাসিমুখে। যথারীতি বেশভূষা ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে জলযোগে বসে বললেন, যাক, এতদিনে মুক্তি পাওয়া গেল ছোটবৌ। সরকারীভাবে খবর এলেও হাইকোর্টের এক বন্ধুর কাছ থেকে আজ টেলিগ্রাম পেলাম আমার জেলখানার মিয়াদ ফুরলো বলে। অধিক বিলম্ব হবে না। বিলম্ব যে হবে না তা নিজেই জানতাম।

আলোকলতা অনতিদূরে একটা চেয়ারে বসে সেলাই করছিলেন, এবং কন্যা শাশ্বতী পিতার পাশে বসে তাঁকে বাতাস করছিল, শুনে দুজনেই চমকে উঠলেন।

স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, এ কথার মানেটা কি?

অবিনাশ বললেন, শুনেছ বোধ হয় কে একজন গোবিন্দপদবাবু এবারেও আমাকে ডিঙিয়ে মাস-ছয়েকের জন্যে সব-জজ হয়ে গেলেন। হগসাহেব হাইকোর্টে আসা পর্যন্ত বছর-তিনেক ধরে এই ব্যাপারই চলচে—একটা কথাও বলিনি। ভেবেছিলাম ওদের অন্যায়টা একদিন ওরা নিজেরাই বুঝবে, কিন্তু দেখলাম সে হবার নয়। অন্ততঃ ও লোকটি থাকতে নয়। অবিচার এতদিন সয়েছিলাম, কিন্তু আর সইলে মনুষ্যত্ব যাবে।

কাল বিকেলেই সদরআলার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে এমনি ধরনের একটি কথা আলোকলতা আভাসে-ইঙ্গিতে শুনে এসেছিলেন কিন্তু অর্থ তার বুঝতে পারেন নি। এখনো পারলেন না, শুধু বললেন, তদবির-তাগাদা না করলে আজকালকার দিনে কোন্ কাজটা হয়? মনুষ্যত্ব যাতে না যায় তার কি করেছ শুনি?

অবিনাশ বললেন, তদবির-তাগাদা পারিনে, কিন্তু যেটা পারি সেটা করেছি বৈ কি।

আলোকলতা স্বামীর মুখের পানে চেয়ে এখনও তাৎপর্য ধরতে পারলেন না, কিন্তু ভয় পেলেন। বললেন, সেটা কি শুনি না? কি করেছ বলো না?

অবিনাশ বললেন, সেটা হচ্ছে কাজে ইস্তফা দেওয়া—তা দিয়েছি।

আলোকের হাত থেকে সেলাইটা মাটিতে পড়ে গেল। বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থেকে বললেন, বলো কি গো? এতগুলো লোককে না খেতে দিয়ে উপোস করিয়ে মারবার সঙ্কল্প করেছ? কাজ ছাড়ো দিকি—আমি তোমার দিব্যি করে বলচি সেই দিনই গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।

অবিনাশ স্থির হয়ে রইলেন, জবাব দিলেন না।

দরখাস্ত যদি দিয়ে থাকো, কালই উইথড্র করবে বলো?

না।

না কেন? মনের দুঃখে ঝোঁকের মাথায় কত লোকেই ত কত কি করে ফেলে, তার কি প্রতিকার নেই?

অবিনাশ আস্তে আস্তে বললেন, ঝোঁকের মাথায় ত আমি করিনি ছোটবৌ। যা করেছি ভেবে-চিন্তেই করেছি।

উইথড্র করবে না?

না।

আমার মরণটাই তাহলে তুমি ইচ্ছে করো?

তুমি ত জানো ছোটবৌ সে ইচ্ছে করিনে। তবু স্ত্রী হয়ে যদি স্বামীর মর্যাদা এমন করে নষ্ট করে দাও যে মানুষের কাছে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে না পারি, তাহলে—

কথাটা অবিনাশের মুখে বেধে গেল—শেষ হলো না। আলোকলতা বললেন, কি তাহলে—বলো?

উত্তরে একটা কঠোর কথা তাঁর মুখে এসেছিল, কিন্তু এবারেও বলা হোলো না। বাধা পড়লো কন্যার পক্ষ থেকে। এতক্ষণ সে নিঃশব্দেই সমস্ত শুনছিল, কিন্তু আর থাকতে

পারলে না। বললে, না বাবা, এ সময়ে মার ভেবে দেখবার শক্তি নেই, তাঁকে কোন জবাব তুমি দিতে পারবে না।

মা মেয়ের স্পর্ধায় প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, পরক্ষণে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, শাশ্বতী, যা এখান থেকে, উঠে যা বলচি।

মেয়ে বললে, যদি উঠে যেতে হয়, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো মা। তোমার কাছে ফেলে রেখে যাবো না।

কি বললি?

বললাম, তোমার কাছে ওঁকে একলা রেখে আমি যাবো না। কিছুতেই যাবো না। চলো বাবা, আমরা নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি গে। সন্ধ্যের পরে আমি নিজে তোমার খাবার তৈরী করে দেবো—এখন থাক গে খাওয়া। ওঠো বাবা, চলো। এই বলে সে তাঁর হাত ধরে একেবারে দাঁড় করিয়ে দিলে।

ওরা সত্যি চলে যায় দেখে আলোক নিজেকে একটু সামালে নিয়ে বললেন, একটু দাঁড়াও। সত্যিই কি একবারও ভাবোনি, চাকরি ছেড়ে দিলে তোমার বাড়ির এতগুলি প্রাণী খাবে কি!

অবিনাশ উত্তর দিতে গেলেন, কিন্তু এবারেও বাধা এলো মেয়ের দিক থেকে। সে বললে, খাবার জন্যে কি সত্যিই তোমার ভয় হয়েছে মা? কিন্তু হবার ত কথা নয়। চাকরি ছাড়লেও বাবা পেনশন পাবেন—সে তিন শ' টাকার কম হবে না। পাশের বাড়ির সঞ্জীববাবু ষাট টাকা মাইনে পান, খেতে তাঁর ন-দশ জন। কতদিন দেখে এসেছি, খাওয়া তাঁদের আমাদের চেয়ে মন্দ নয়। তাঁদের চলে যাচ্চে, আর আমাদের তিন-চারজনের খাওয়া-পরা চলবে না!

মায়ের আর ধৈর্য রইলো না, একটা বিশ্রী কটূক্তি করে চেঁচিয়ে উঠলেন—যা দূর হ আমার সুমুখ থেকে। তোর নিজের সংসার হলে গিন্নীপনা করিস, কিন্তু আমার সংসারে কথা কইলে বাড়ি থেকে বার করে দেবো।

মেয়ে একটু হেসে বললে, বেশ ত মা, তাই দাও। বাবার হাত ধরে আমি চলে যাই, তুমি আর দাদা বাবার সমস্ত পেনশন নিয়ে যা ইচ্ছে করো, আমরা কেউ কথা কব না। আমি যে-কোন মেয়ে ইস্কুলে চাকরি করে আমার বুড়ো বাপকে খাওয়াতে পারবো।

মা আর কথা কইলেন না, দেখতে দেখতে তাঁর দু' চোখ উপচে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়লো।

মেয়ে বাপের হাতে একটু চাপ দিয়ে বললে, বাবা, চলো না যাই। সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

অবিনাশ পা বাড়াতেই আলোকলতা আঁচলে চোখ মুছে ধরা-গলায় বললেন, আর একটু দাঁড়াও। তোমার এ কি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা? এর নড়চড় কি নেই?

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বললেন, না। সে হবার জো নেই।

দেখো, আমি তোমার স্ত্রী, তোমার সুখ-দুঃখের ভাগী–

অবিনাশ বাধা দিলেন, বললেন, তা যদি সত্যি হয় ত আমার সুখের ভাগ এতদিন পেয়েছ, এবার আমার দুঃখের ভাগ নাও।

আলোক বললেন, রাজি আছি কিন্তু সমস্ত মান-ইজ্জত বজায় রেখে এতগুলো টাকায় চলে না, এই সামান্য ক'টা পেনশনের টাকায় চালাবো কি করে?

অবিনাশ বললেন, মান-ইজ্জত বলতে যদি বড়মানুষি বুঝে থাকো ত চলবে না আমি স্বীকার করি। নইলে সঞ্জীববাবুরও চলে।

কিন্তু তোমার মেয়ে? উনিশ-কুড়ি বছরের হলো, তার বিয়ে দেবে কি করে?

মেয়ের সমস্যার সমাধান করতে শাশ্বতী বললে, মা, আমার বিয়ের জন্যে তুমি ভেবো না। যদি নিতান্তই ভাবতে চাও ত বরঞ্চ ভেবো সঞ্জীববাবু কি করে তাঁর দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।

উত্তর শুনে মায়ের আর একবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। সজল চক্ষু দৃপ্ত হলো, ধরা-গলা মুহূর্তে তীক্ষ্ণ হয়ে কণ্ঠস্বর গেল উচুঁ পর্দায় চড়ে। বললেন, শাশ্বতী, পোড়ারমুখী, আমার সুমুখ থেকে এখনো তুই দূর হয়ে গেলি নে কেন? যা যা বলছি।

যাচ্ছি মা। চলো না বাবা।

পাশের ঘরে হিমাংশু কবিতা রচনায় রত ছিল। আই. এ. পরীক্ষার তৃতীয় উদ্যমের এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। তার কবিতা 'বাতায়ন' পত্রিকায় ছাপা হয়, আর কোন কাগজওয়ালা নেয় না। 'বাতায়ন'-সম্পাদক উৎসাহ দিয়ে চিঠি লেখেন, "হিমাংশুবাবু, আপনার কবিতাটি চমৎকার হয়েছে। আগামীবারে আর একটা পাঠাবেন—একটু ছোট করে। এবং ঐ সঙ্গে শাশ্বতী দেবীর একটি রচনা অতি অবশ্য পাঠাবেন। " জানিনে, 'বাতায়ন'-সম্পাদক সত্যি বলেন, না ঠাট্টা করেন। কিংবা তাঁর আর কোন উদ্দেশ্য আছে। শাশ্বতী দেখে হাসে—বলে, দাদা, এ চিঠি বন্ধু-মহলে আর দেখিয়ে বেড়িও না।

কেন বলতো?

না, এমনিই বলচি। নিজের প্রশংসা নিজের হাতে প্রচার করে বেড়ানো কি ভালো?

কবিতা পাঠানোর আগে সে বোনকে পড়ানোর ছলে ভুল-চুকগুলো সব শুধরে নেয়। সংশোধনের মাত্রা কিছু বেশি হয়ে পড়লে লজ্জিত হয়ে বলে, তোর মত আমি ত আর বাবার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য পড়িনি, আমার দোষ কি? কিন্তু জানিস শাশ্বতী, আসলে এ কিছুই নয়। দশ টাকা মাইনে দিয়ে একটা পণ্ডিত রাখলেই কাজ চলে যায়। কিন্তু কবিতার সত্যিকার প্রাণ হলো কল্পনায়, আইডিয়ায়, তার প্রকাশ-ভঙ্গিতে। সেখানে তোর কলাপ মুগ্ধবোধের বাপের সাধ্যি নেই যে দাঁত ফোটায়।

সে সত্যি দাদা।

হিমাংশুর কলমের ডগায় একটি চমৎকার মিল এসে পড়েছিল, কিন্তু মায়ের তীব্রকণ্ঠ হঠাৎ সমস্ত ছত্রভঙ্গ করে দিলে। কলম রেখে পাশের দোর ঠেলে সে এ ঘরে ঢুকতেই মা চেঁচিয়ে উঠলেন, জানিস হিমাংশু, আমাদের কি সর্বনাশ হলো? উনি চাকরি ছেড়ে দিলেন,—নইলে মনুষ্যত্ব চলে যাচ্ছিল। কেন? কেননা কোথাকার কে একজন ওঁর বদলে সব-জজ হয়েছে, উনি নিজে হতে পারেন নি। আমি স্পষ্ট বলচি, এ হিংসে ছাড়া আর কিছু নয়। নিছক হিংসে!

হিমাংশু চোখ কপালে তুলে বললে, তুমি বলো কি মা! চাকরি ছেড়ে দিলেন? হোয়াট্ নন্‌সেন্স!

অবিনাশের মুখ পাংশু হয়ে গেল, তিনি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে স্থির হয়ে রইলেন। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় তাঁর সমস্ত চেহারাটা যেন কি একপ্রকার অদ্ভুত দেখালো।

শাশ্বতী পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলো—উঃ—জগতে ধৃষ্টতার কি সীমা নেই বাবা! তুমি চলো এখান থেকে, নইলে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো। বলে, অর্ধ-সচেতন বাপকে সে জোর করে টেনে নিয়ে বাড়ি থেকে বার হয়ে গেল